ঈশ্বরই সকল বস্তুর সৃষ্টি কর্তা - ক্রমবিকাশের তত্ত্ব-মিথ্যা

মানুষকে নিয়ে ঈশ্বরের যে উদ্দেশ্য তা
প্রমান করেছে বিশ্ব ব্রহ্মান্ডে তাঁর
আর্শ্চয্যময় মহান সৃষ্টি সমূহ

সম্পাদনায় - জি.ই. ম্যানস্‌ফিল্ড

সকল বস্তুই ঈশ্বরের সৃষ্টি - "সৃষ্টির ক্রমবিকাশ তত্ত্ব ভিত্তিহীন"
(God Created Everything – Evolution is False)

সমগ্র 'বিশ্বব্রহ্মান্ড'ই প্রমান করে মানবজাতিকে নিয়ে ঈশ্বরের উদ্দেশ্য, সীমাহীন আকাশ, অতিকায় এই গোলার্ধ যাকে 'পৃথিবী' বলা হয় এবং যেই পৃথিবীতে বিভিন্নরকম, অগণিত শ্রেণীর চমকপ্রদ সব প্রাণীর বসবাস তা কি আকস্মিক বা নিজে থেকেই সৃষ্টি হয়েছিল? জীবনের যত জটিলতার পেছনে শুধু কি নিস্ফল ভাগ্যই দায়ী? না এ সকলের পেছনে কোন রহস্য বা চরম উদ্দেশ্য বিদ্যমান?

বিগত ১৯১৪ সন থেকে পৃথিবীতে এক বিরাট পরিবর্তন এসেছে আদিকালীন সময়ের তুলনায়। ১৯১৪ সনের পূর্বে জীবন ধারনে তত আরাম আয়েশ ছিল না, মটরগাড়ী ছিল অপ্রতুল, অপর্যাপ্ত যানবাহন ছিল, উড়োজাহাজ শুধু ফিল্মী দুনিয়াতেই ছিল, সাধারনের জন্য কল্পনার বিষয় ছিল। অবশ্য বিদ্যুতের সরবরাহ এখনকার মতই অপর্যাপ্তই ছিল। যদিও তা ছিল বিলাসী জীবন যাপনের জন্য। সর্বোপরী নীতি ও আর্দশগত ভাবে একই মানের ধারা সমগ্র পৃথিবীর বেশীরভাগ অঞ্চলে ভিক্টোরিয়ান নৈতিকবাদে শাসিত হতো।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ নিয়ে আসে আমূল পরিবর্তন। নূতন নূতন আবিষ্কার সকল কিছুর গতিপথ অভূতপূর্ব সচল ও তথাকথিত উন্নত করে, পবিত্রশাস্ত্রের ভবিষ্যৎবানীর পূর্ণতানুযায়ী *"...এবং জ্ঞানের বৃদ্ধি হইবে"* (দানিয়েল ১২:৪)। অনেক কিছুর মতই বিদ্যুৎ সরবরাহ ও ব্যবহার বৃদ্ধি পায়, রেডিও খেলনা বস্তুতে পরিণত হয়, নব নব সংস্করন উদ্ভবের ফলে টি.ভির ও বিভিন্ন নূতন সংযোজন হয়, অপরদিকে যুদ্ধ ক্ষেত্রে, আকস্মিক প্রাকৃতিক ও অন্যান্য দূর্ঘটনায় অগণিত লোক প্রতিদিনই মৃত্যুর মুখোমুখি হয়, 'ভিক্টোরিয়ান' নীতি, লীগ বায়ুর মত উড়ে যায় আধুনিক নীতি নির্ধারণ বা মতবাদের কাছে। আধুনিকায়ন এবং নব নব টেকনোলোজি, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে মানুষ হতবিহ্বল হয়ে মনুষ্য জ্ঞানের গভীরতাকে বাহ্বা দিতে রত হয়ে ভূলে যায় ঈশ্বরের অস্তিত্ব, মানুষের সৃষ্টিকর্তা স্বয়ং 'ঈশ্বর' তাঁর সৃষ্টির চিন্তা চেতনায় হয়ে যায় বিবর্তনের বিষয়বস্তু, ঈশ্বরের সূত্র হয়ে পড়ে বিবর্তণবাদের সূত্র, অর্থাৎ মানুষই সকল কিছুর ধারক ও বাহক যা কিছু কালের গতিতে ক্রমবিকাশ লাভ করেছে, এর মধ্যে ঈশ্বরের কোনই কতৃত্ব নেই, তাঁকে বা তাঁর আদেশের কোন মূল্যই নেই মানুষের কাছে।

কোন না কোন মানুষ অভিজ্ঞ হলো অনেক মহাশক্তিকে তাদের আয়ত্বে আনতে এমনকি মহাশূন্যকে অতিক্রম করে একের পর এক গ্রহ, উপগ্রহ বিচরন করতে সক্ষম হলো, ফলে অজানা ঈশ্বরকে দূরে ঠেলে দিয়ে নিজেরাই নিজেদেরকে সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞান সম্পন্ন ভাগ্যবিধাতা ভাবতে শুরু করে।

একটি পৃথিবী ভুলের অতলে তলিয়ে গেল (A World gone wrong)

সম্প্রতি বস্তুবাদ দর্শনের ব্যপকতা লাভই প্রমান করে যে মানুষ ঈশ্বরের সান্নিধ্য থেকে কত দূরে। বিবর্তনবাদ বা ক্রমবিকাশের তত্ত্ব উপস্থাপনা করে যে, সকল কিছুই কোন না কোন জটিল অবস্থা বা পদ্ধতিতে কালক্রমে সৃষ্টি বা বিকাশ লাভ করেছে, সব কিছুরই প্রকৃতির নিয়মে আপনা আপনিই সৃষ্টি বা প্রকাশ হয়েছে এর পেছনে বিচক্ষণ বা শক্তিমান কোন ব্যক্তিত্ব বা সৃষ্টিকর্তার কোন ভূমিকাই নেই। মনুষ্যজাতি নিজেদের জীবন যুদ্ধে, সামাজিক কোন্দলে অতঃপর মহাবিশ্বযুদ্ধে জর্জরিত হয়ে সার্বিকভাবে পতিত হয়ে স্বাভাবিক জীবন যাপনে বঞ্চিত হওয়া শুরু করলো। ঠিক তখনই বিবর্তনবাদের ধারণা সমূহ রাজনীতিতে স্থান পেল, কমিউনিজম মতবাদকে মানুষ আঁকড়ে ধরলো এক ঈশ্বরে বিশ্বাস এবং ধর্ম বিশ্বাস তুচ্ছীকৃত হয়ে কমিউনিজম জনপ্রিয় হয়ে উঠতে থাকলো। এই ধারণা বদ্ধমূল হলো কালমার্কস রাজনীতিতে যে ক্রমবিকাশ এনেছে, সৃষ্টিতত্ত্বে তথা বিজ্ঞানেও ডারউইন সেই একই বিবর্তন এনেছে। বর্তমানেও বিভিন্ন দেশের রাজনীতিতে কমিউনিজমের কিছু কিছু মতবাদ প্রবর্তিত করে অনেক দেশই প্রমানে রত, দাবী করছে তারা উন্নতির শিখরে পৌছাঁতে সক্ষম হয়েছে বা হচ্ছে।

এমতাবস্থায় মনুষ্যজাতি ধর্ম বিশ্বাসে দোদুল্যমান। মানুষের উপর বাইবেলের প্রভাব ক্রমশঃ কোন ঠাসা হয়ে গেছে। উগ্রতার কাছে নৈতিক মূল্যবোধ ঝিমিয়ে পড়ে পুরাতন কল্প কাহিনীতে পরিণত হয়েছে। যতই পৃথিবীর সকল প্রকার উত্তমতা ক্ষয়ের দিকে এগোচ্ছে ততই স্বর্গীয় পিতার নীতি সমূহ, তাঁর পিতৃত্ববোধের মূল্যবোধ ক্ষীণ হয়ে যাচ্ছে মানুষের চিন্তা চেতনায়। ফলে সমাজে অনাচার, অবিচার, স্বামী স্ত্রীর মধ্যে তালাকের হার, অপ্রাপ্ত বয়সীদের বিবাহ নামক প্রহসন, সমলিঙ্গে বিবাহের মত অখন্ডনীয় পাপ, সকল প্রকার বিবর্জিত মন্দতায় সমগ্র পৃথিবী পূর্ণ হতে চলছে। সমগ্র পৃথিবী একই প্রকার নৈতিক অবক্ষয়ে এতবেশী জর্জরিত, যাতে করে সকল গোত্রের তথা জাতীয় ভাবে মানব সভ্যতার আদি পরিচিত ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে অকালেই।

এর কারণ হচ্ছে মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশের তত্ত্ব

মনুষ্য জাতির থেকে ঈশ্বরের অস্তিত্বকে দূরে সরাবার পেছনে বিবর্তনবাদ তত্ত্বের ভূমিকা যথেষ্ট। অন্যকোন তত্ত্ব বা কোন বৈজ্ঞানিক সূত্রের এবিষয়ে কোন অবদান নেই। যদিও ক্রমবিকাশের ধ্যান ধারণা সম্পূর্ণ বানোয়াট, কেননা আজ পর্যন্ত এই সূত্রকে কোন বৈজ্ঞানিক, কোন দার্শনিক বা কেউই সঠিকভাবে সত্য প্রমানে সক্ষম হয়নি। যেই সূত্রটি তখনকার পারিপার্শ্বিক ও বাস্তবে প্রয়োগের প্রয়োজনে উদ্ভব হয়েছিল। সত্যিকার অনুসন্ধানকারীদের গবেষনায় বির্বতনবাদের সূত্রের দাবী অখন্ডনীয় সত্য হিসেবে স্থান পায়নি। মতবাদ সমূহ সমাজে উদ্ভব সকল প্রকার সমস্যা, অসুবিধার সমাধান তো দিতেই পারেনি বরং অভাবনীয় নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের প্রধান কারনে পর্যবসিত হয়েছে। আর সেই কারনেই আজ সমাজে, পরিবারে ভাঙ্গন, জাতিতে জাতিতে কোন্দল, দেশে দেশে যুদ্ধ বিগ্রহের হার এত প্রবল। যদিও পবিত্র বাইবেল এই সম্পর্কে অতি পূর্ব হতে সর্তক করে ভবিষ্যৎবানী করেছে এবং ভবিষ্যৎ প্রত্যাশায় নিশ্চিত

করেছে, ১ম তিমথীয় ৪:৮ পদ *"...কিন্তু ভক্তি সর্ববিষয়ে সুফলদায়ক, তাহা বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবনের প্রতিজ্ঞাযুক্ত"*।

যাহোক, এ সকল অসুবিধার থেকেও সবথেকে বড় উদ্বিগ্নতার বিষয় হচ্ছে যে, বিবর্তনবাদ এমন সব নিরীহ জনগন গ্রহণ করেছে, যারা এই মতবাদের প্রতারনাপূর্ণ ভ্রান্তিজনক শিক্ষা এবং এটি পালনে ভয়ঙ্কর ফলাফল সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। যদিও এটি অপ্রমানিত মতবাদ তবুও বর্তমানে স্কুল কলেজের পাঠ্যপুস্তকে সম্প্রসারিত হয়েছে। প্রায়ই এমনভাবে এটি শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে যেন মনে হয় বহুপূর্ব হতে মতবাদটি সত্য হিসেবে প্রচলিত হয়ে আসছে অপরদিকে জীবন্ত সত্য বাইবেলের বাক্যের কোন মূল্যই নেই। এইভাবে লোকেরা তাদের শিশুকাল থেকেই তাদের পূর্বপুরুষদের জীবন ধারন পদ্ধতির সাথে সাথে তাদের দিনকালের মান সম্পর্কে শিক্ষা পেয়ে আসছে এবং বাইবেলে বর্ণিত সুসমাচার ও ব্যক্তিগত পরিত্রান বিষয়ক বার্তাকে অবজ্ঞা করে আসছে।

এই সব লোকেরা খ্রীষ্টের এই পৃথিবীতে পুনরাগমন (প্রেরিত ১:১১; ৩:১৯) এবং শিক্ষাদান কালে তাঁর প্রতিজ্ঞা যে তিনি ফিরে আসার পূর্ব পর্যন্ত যারা তাঁকে বিশ্বাস করে মৃত্যু বরণ করেছে তাদেরকে খ্রীষ্ট পুনঃজীবিত করে অনন্ত জীবন দেবেন (মথি ১৯:২৮-২৯), এই চরম সত্যকে অস্বীকার করেছে এবং এখনও করছে। তারা অবান্তর বলে মনে করে যে, ঈশ্বর এই পৃথিবীতে তাঁর রাজ্য প্রতিষ্ঠা করবেন (দানিয়েল ২:৪৪) এবং যীশু খ্রীষ্ট হবেন সেই রাজ্যের একমাত্র রাজা (১ম করিন্থীয় ১৫:২৪, সখরিয় ১৪:৯)। এই সকল সত্যকে অস্বীকার করার ফলে, মানুষকে ধ্বংসের হাত থেকে মুক্তির জন্য ঈশ্বর প্রদত্ত অনুগ্রহ থেকে (যোহন ৩:১৬) তারা বঞ্চিত হচ্ছে, ফলে তারা নিজেদের পরিত্রানের পথ চিরতরে হারাচ্ছে।

মানুষ কতটুকু বুদ্ধিমান? (How clever is Man?)

পবিত্র বাইবেল হচ্ছে আন্তরিক ভাবে স্বচ্ছ বিশ্বাস ভিত্তিক। অথচ আজকের বস্তুবাদী মানুষ যাদের প্রতিটি পদক্ষেপ ছলছাতুরী, ভ্রান্ততায় ভরপুর তাদের পক্ষে বাইবেলীয় বিশ্বাসকে উপহাস, অবজ্ঞা করা খুবই স্বাভাবিক। মানুষ চিন্তা করে জীবনের সকল সমস্যার সমাধান সে জানে, সব জটিলতাই সে দূর করতে সক্ষম। কিন্তু কতবড় ভুল ধারনা এটি, সে হয়তো কোন না কোন বিষয়ে বুদ্ধিমান কিন্তু সব বিষয়ে নয়, জীবনের সকল জটিল বিষয়ের উত্তর তার জানা নেই, মানুষ জ্ঞান, বুদ্ধি রাখে শুধুমাত্র সেসব বিষয়ে যেগুলিকে স্বয়ং ঈশ্বর তাঁর জন্য অনুমোদন করেছেন। সর্বশক্তিমানের অনুমোদন সাপেক্ষেই মানুষ অনেক কিছু আবিষ্কারে সক্ষম হয়েছে, তা সত্ত্বেও আরও অনেক উপাদান সম্পর্কে জানতে এখনও মানুষ অপারগ ও অজ্ঞ।

ধরা যাক, 'বিদ্যুৎ' বিষয়ে, আমাদের প্রতি দিনের জীবন ধারনে বিদ্যুৎ খুব বেশী প্রচলিত, তথাপি বৈজ্ঞানিকগণ তাদের সবধরনের চেষ্টা চালিয়েও আজও বলতে সক্ষম হয়নি এটি কি

বিষয়? অথবা এটি কোথা থেকে আসছে? তারা শুধু জানে পজিটিভ্ ও নেগেটিভ্ তার সংযুক্ত হয়ে বিদ্যুৎ সৃষ্টি করা যায়, জানে এর ভাল ও ক্ষতিকারক দিকগুলি কিন্তু এসবের মূল উৎস ও প্রকৃত কারণ এখনও অজানা। ধরা যাক, আধুনিক জনপ্রিয় মাধ্যম রেডিও ও ভিডিও ট্রান্সমিশনের বিষয়টি বৈজ্ঞানিক শুধুমাত্র এগুলি তৈরীর উপাদান সমূহ আবিষ্কার করেছে, কিন্তু সেগুলি তারা সৃষ্টি করেনি, আজ পর্যন্ত কোন বৈজ্ঞানিকই ইলেকট্রন অথবা টানগ্‌ষ্টেন (Tungsten) যা থেকে ইলেকট্রডস (Electrodes) তৈরী হয় সেটা তৈরী করতে পারেনি, তারা এই পৃথিবীর বুকেই পেয়েছে তাহলে কি সেগুলি ঈশ্বরই সৃষ্টি করেননি?

আরও একটি বিষয় দেখা যাক, ২৪ ঘন্টার মধ্যে মানুষ সম্ভবতঃ ৮ ঘন্টা বিছানায় কাটায়, বিশ্রাম করে অথবা ঘুমাবার চেষ্টা করে, কেন? কেন ঘুম প্রয়োজন এত? চিকিৎসগণও এর সঠিক উত্তর জানেন না, তিনি হয়তো বলবেন মানুষ সারাদিন পরিশ্রম করে তাই তার বিশ্রামের প্রয়োজন রাতে, যাতে করে তার দেহ উদীপ্ত হতে পারে, দেহের প্রয়োজনে যেমন খাদ্য তেমনি বিশ্রামেরও একান্ত প্রয়োজন, ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু তিনি নিজেও জানেন না কেন মনুষ্যদেহের জন্য ঘুম অবশ্যই প্রয়োজন, যদি মনুষ্য দেহ সম্পর্কে চিকিৎসকগনের যথেষ্ট পেশা ভিত্তিক জ্ঞান আছে, তবুও একটি প্রশ্নে সেই জ্ঞান সীমাবদ্ধ।

বর্তমান পৃথিবীতে 'আশ্চর্য্য কাজ' শব্দটি প্রায়ই ব্যবহৃত হয় মানুষের কোন কাজকে স্বীকৃতি বা বাহ্‌বা দিতে কিন্তু বাইবেলের ক্ষেত্রে শব্দটি ততখানি জনপ্রিয় নয়, মাথার উপর বিশালকায় জাম্বুজেট উড়ে যেতে দেখলে মানুষ বলে, আশ্চর্য্য জ্ঞানবান মানুষ যারা এই আশ্চর্য্য কর্মটি সম্পন্ন করেছে অপরদিকে বাইবেলের আশ্চর্য্য কাজের বিষয়ে শুনে উচ্চ রবে ব্যাঙ্গত্মক হাসি হাসে।

বিবর্তনবাদের মন্দতা (The Evil of Evolution)

সুদূর দৃষ্টি নিয়ে যদি আমরা ক্রমবিকাশের সূত্রটি পর্যালোচনা করি তাহলে দেখা যাবে এই সূত্রমতে 'জীবন' এর অস্তিত্বের শুরু হঠাৎ করেই হয়েছে। তাহলে কি করে জীবনের জটিলতা, কখনো বা একতালে চলা, বা ভিন্নখাতে চলা বা 'জীবন' প্রবাহিত হওয়া সম্ভব হয় যদি না জীবন সৃষ্টির পেছনে কোন উদ্দেশ্য বা নির্দেশনা বিরাজিত না থাকে, 'জীবন' যদি কাদামাটি থেকে আপনা আপনিই অজানা কোন দূর্ঘটনার দ্বারা গঠিত হয় তাহলে জীবন প্রাপ্তি দেহে কিভাবে দুটো হাত, দুটো পা, দুটো চোখ, দুটো কান নিখুঁত ভাবে, মাথা, নাক অন্যান্য প্রয়োজনীয় অঙ্গ (নারী পুরুষের ভিন্ন ভিন্ন) তাদের স্ব স্ব স্থানে অবস্থান পেয়েছে, কিভাবে এই সুনির্দিষ্টতা সম্ভব হতে পারে হঠাৎ করে জীবনের সৃষ্টিতে। সুতরাং এই সব ধারণাকে চিন্তায় এনে ক্রমবিকাশের সূত্র বিশ্বাস করা একবারেই অসম্ভব।

একটি ঘড়ির বিষয় ধরা যাক, আমি এর প্রতিটি অংশ অংশ আলাদা করে ঘড়িটির যান্ত্রিক কৌশল জানবার চেষ্টা করেছি, আমি জানি ঘড়িটির সৃষ্টি এক নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে যেটার আকারও আছে, আমার মনের ও চিন্তা ধারায় যান্ত্রিকতা সম্পর্কে তত সুস্পষ্ট ধারণা নেই। আমি ঘড়ি নামক এই বস্তুটির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ গুলির যান্ত্রিক কৌশল এবং তা কিভাবে টিক টিক করে চলে তার কিছুই বুঝি না। অথচ ক্রমবিকাশের মতবাদ আমায় শিক্ষা দেয় যে ঘড়িটি আপনা আপনিই নিজে থেকে তৈরী হয়েছে। ঘড়িটির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ গুলি আমাদের সময় জানাবার জন্যে ব্যবহৃত হয়, সেগুলিকে যিনি জোড়া দিয়েছেন ঘড়িটির যন্ত্র কৌশল সম্পর্কে হয়তো সে নিজেও জানে না, অথচ এর পেছনে কাজ করার ফলে একদিন সেটি অকস্মাৎ ঘড়ি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। আমার এই ব্যঙ্গোক্তি যে অস্বাভাবিক নয়, তা প্রতিটি বিজ্ঞানীই খুব সহজেই বুঝতে পারবে কারণ ঐরকমই (ঘড়ির উদাহরন) অবান্তর নীতি হচ্ছে ক্রমবিকাশ সূত্রের ভিত্তি।

কেমন করে মনুষ্য 'জীবন' অস্তিত্ব ধারন করেছে? এক ব্যক্তি আমাকে বলেছিলো, অতীতে কোন একসময় একটি প্রচন্ড উত্তাল সামুদ্রিক ঢেউ তীরে এসে আছড়িয়ে পড়ে মনুষ্য প্রানের সৃষ্টি হয়। কিন্তু কোন সমুদ্রে এবং কি কারনে সেই উত্তাল ঢেউটি প্রবল শক্তিতে তীরে এসে পড়ে সেটা সেই ব্যক্তিও জানে না, তার পৃথিবী ও মানুষ সৃষ্টির এই সূত্রটি আমার কাছে মনে হয়েছে অন্ধ ব্যক্তির পথচলা তার সাদাছড়িটি ছাড়াই। কি চমৎকার বিষয়, যাদুর মত, আশ্চর্যতম উত্তাল ঢেউটির জলের আঘাত পাওয়া মাত্রই মনুষ্য প্রাণের সৃষ্টি।

অতঃপর অন্য আরেক জন বিজ্ঞানী আমাকে বলেছিলো, মনুষ্য সৃষ্টির প্রথম সূত্রটি (উপরে বর্ণিত) ভুল। তার বর্ণনা ছিল আরও অদ্ভুত। যাহোক, এ বিষয়ে বিভিন্ন বিজ্ঞানীদের তত্ত্ব পর্যালোচনা করে, বিশেষ করে ক্রমবিকাশ বা বিবর্তনবাদের তত্ত্ব সম্পর্কে গবেষনা করে আমি দেখেছি একজন বিজ্ঞানীর তত্ত্ব আরেক জন বিজ্ঞানী বাতিল বলে ঘোষনা করেছে কোন সঠিক প্রমানাদি ছাড়াই, আমার কাছে তাদের বিভিন্ন জনের শিক্ষাকে বিপরীতধর্মী বলে মনে হয়েছে, ঐ সকল বিজ্ঞানীগন যখন ক্রমবিকাশ নামক মতবাদে কোন সত্য প্রমান বা একমত প্রকাশে ব্যর্থ তাহলে মতবাদটির যথার্থতা ও সত্যতা যে কতটুকু তা একজন সচেতন ব্যক্তি সহজেই অনুমান করতে পারেন। অপরদিকে পবিত্র বাইবেল মনুষ্য সৃষ্টি সম্পর্কে স্পষ্ট, স্বচ্ছ, সহজ বোধ্য শিক্ষা দেয়, *"আদিতে ঈশ্বর আকাশমন্ডল ও পৃথিবী সৃষ্টি করিলেন"* (আদিপুস্তক ১:১)। কিন্তু আমাদের মনে রাখা উচিৎ যে, ঈশ্বরকে অস্বীকার করে যেই ক্রমবিকাশের মতবাদটি সেইটাই স্কুলে ছাত্র ছাত্রীদের শিক্ষা দেওয়া হয়, সেই অল্প, অবুঝ বয়স থেকেই ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি অসম্মান, অশ্রদ্ধা করতে শেখানো হচ্ছে, তাদেরকে এমন চিন্তাধারা, চেতনা দেওয়া হচ্ছে যেটা ভবিষ্যতে তাদের জীবন ধ্বংসের কারণ হবে। প্রতিটি পিতামাতার জন্যে সবথেকে বড় সম্পদ হচ্ছে তাদের সন্তানদের ঈশ্বরের মহানত্ব ও তাঁর আত্মিক শিক্ষা প্রদানে সমৃদ্ধ করা যাতে তারা তাদের ভবিষ্যৎ জীবন সংরক্ষিত করতে সক্ষম হয়।

মনুষ্য কি মহাশূন্যের গভীরতার সন্ধান পেয়েছে?
(Has man penetrated space?)

টেলিস্কোপ আমাদেরকে ধারণা দেয় যে আমাদের এই অতিকায় পৃথিবীটি মহাশূন্যের কাছে কত ক্ষুদ্র, ছোট্ট কনার আকারে পৃথিবীটি অসীম মহাশূন্যে ভেসে বেড়াচ্ছে। যখন আমরা আকাশের দিকে দৃষ্টি দেই দেখি সীমাহীন মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে, এই শূন্যতার পরে কি? এবং তারপরেও আরও কি আছে? যখন আমরা এসব নিয়ে চিন্তা করি তখন কি আমাদের মনে উদয় হয় না যে, এই মরণশীল প্রাণী থেকেও মহা শক্তিশালী কেউ একজন আছেন যিনি এই গ্রহ, উপগ্রহ তথা সমগ্র বিশ্বব্রহ্মান্ডের নিয়ন্ত্রনকর্তা আমরা শুধুমাত্র এইটুকুই ধারণা করতে সক্ষম যে, একমাত্র স্বর্গরাজ্যেতেই আমরা এই অসীমতার সামনা সামনি হতে পারবো। আমাদের এই পৃথিবী নামক গ্রহটির সবথেকে কাছের (চাঁদ এবং পৃথিবীর স্যাটেলাইট বাদে) গ্রহটি হচ্ছে শুক্র, শুক্রগ্রহ প্রদক্ষিণরত অবস্থায় যখন পৃথিবীর কাছাকাছি হয় সেই দূরত্ব হচ্ছে ৩৯,০০০,০০০ কিলোমিটার। পৃথিবী, শুক্রগ্রহ সহ অন্যান্য গ্রহ, উপগ্রহ যে সূর্যকে বৃত্তাকারে প্রদক্ষিণ করে সেই সূর্যটি থেকে পৃথিবীর দূরত্ব ১৫০,০০০,০০০ বর্গমিটার। সূর্য হচ্ছে সৌর প্রণালীর কেন্দ্র। এই সৌর প্রণালীর নিকটতম তারাটির (এই তারাটিরও নিজস্ব প্রণালী বা গ্রহ আছে, প্রতিটি তারা হচ্ছে এক একটি সূর্য তাদের নিজ নিজ শক্তিবলে) নাম 'আলফা সেন্চুরী' যেটা প্রায় ৪২ মিলিয়ন বর্গকিলোমিটার দূরে অবস্থিত।

বিশালতম 'মিল্কিওয়ে' (Milky Way) সৌর প্রণালী হচ্ছে বিন্দু চিহ্নের মত অর্থাৎ এত ক্ষুদ্র অবস্থান, মাঝে মাঝে রাতের আকাশে বিচ্ছুরিত হয়ে মিলিয়ে যেতে দেখা যায়। সূর্যবাদে আকাশে যে আলো বিচ্ছুরিত হতে দেখা যায় তার সবকটিই এক একটি শক্তিশালী সূর্য যারা তাদের নিজস্ব সৌর প্রণালী (গ্রহ উপগ্রহ সহ) নিয়ন্ত্রন করে, ঠিক আমাদের সূর্যের মত, কোন কোনটা আমাদের সূর্যের থেকে আকারে বৃহৎ। খালিচোখে আকাশে আমরা যে সব বিন্দুর মত আলোকচ্ছটা দেখতে পাই, একটি টেলিস্কোপ দিয়ে তার থেকে হাজার, হাজার অসংখ্য আলোক বিন্দু দেখতে পাবো। যত বড় শক্তিশালী টেলিস্কোপ মানুষ আবিষ্কার করেছে তা দ্বারা মানুষ উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছে যে মহাশূন্যে অবস্থিত আরও অনেক অজানা বস্তু যা তারা এখনও আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়নি, এই অসীম অজানা বস্তুদের সম্পর্কে জানতে বা আবিষ্কার করতে সক্ষম হবে কিনা কোনদিন তাও তারা জানে না। তথাপি এই বিস্ময়কর সৃষ্ট বস্তুগুলি পরিচালিত হচ্ছে নির্ভুল সঠিক পরিনাম দর্শিতায় নিয়মের দ্বারা যেটা মনুষ্য দ্বারা তৈরী সবথেকে উত্তম ঘড়ির থেকেও উত্তমতম। আমরা কি তাহলে মনে করবো যে, 'লেডীলাক্' (Lady luck) এই অবিস্মরনীয় সৃষ্টির পেছনে কাজ করেছে! অথবা অকস্মাৎ কোন দুর্ঘটনায় এই বিস্ময়কর সৃষ্টিগুলি তাদের নিয়মে চলছে? আমার মনে হয় এই অবান্তর ধারণা আমাদের চিন্তাধারাকে কলুষিত করার আগেই এই ধারণাকে বাতিল করা উচিৎ।

উপরোক্ত সামান্য কিছু বর্ণনা দ্বারা আমরা স্বর্গীয় সৃষ্টির বিস্ময়কর সৃষ্টি সম্পর্কে কিছুটা ধারণা করতে পারি যা কিনা মনুষ্য কর্তৃক নির্ণয় একেবারেই অসম্ভব তবুও মূর্খ মানুষ সেই নিষ্ফল সাধনায়রত, মানুষের গড় আয়ুষ্কাল ৮০-১০০ বছর, অথচ মহাশূন্যের সমস্ত ফাঁক ফোকড় অনুসন্ধানে সময় লাগবে কয়েকলক্ষ যুগ, তাও সে সকল তত্ত্বের সন্ধান পাবে কিনা তা একমাত্র অর্ন্তযামীই জানেন, মানুষ এই সকল নির্ণয়ের একটি 'একক' এর প্রচলন করেছে, যার নামকরণ করেছে 'আলোকবর্ষ'। 'আলোকবর্ষটি'র গতি বা বেগ প্রতি সেকেন্ডে ৩০০,০০০ কিলোমিটার, ৩০০০,০০০ x ৬০ = গুনফল হচ্ছে একমিনিটের দূরত্ব, ৩০০০,০০০ x ৬০ x ৬০ = গুনফল হচ্ছে এক ঘন্টার দূরত্ব, ৩০০০,০০০ x ৬০ x ৬০ x ২৪ = গুনফল হচ্ছে এক দিনের দূরত্ব অতঃপর ৩০০০,০০০ x ৬০ x ৬০ x ২৪ x ৩৬৫ = গুনফল হচ্ছে এক বছরের দূরত্ব অর্থাৎ প্রায় ১০ মিলিয়ন মিলিয়ন কিলোমিটার (এতলম্বা স্কেল বা মাপবার যন্ত্র মানুষ এখনও আবিষ্কার করেনি) দূরে আমাদের গ্রহ পৃথিবীর নিকটবর্তী তারকা 'আলফা সেনচুরী' অবস্থিত, পৃথিবী থেকে $^{১}/_{৩}$ আলোকবর্ষ এর দূরত্ব, আরও এইভাবে বলা যেতে পারে যে, যে রকেটটি চন্দ্রে অবতরন করেছিল সেটিকে যদি 'আলফা সেনচুরী'র অনুসন্ধানে পাঠানো হয়। তাহলে রকেটটির সেখানে পৌঁছাতে সময় লাগবে প্রায় ৫,০০০ বছরের বেশী, আমার মনে হয় যারা এই প্রকল্পটি চালু করবেন তাদের মধ্যে কেউই এবং কর্মরত পরবর্তী কয়েক জেনারেশনের কেউই জীবিত থাকবেন না। এই অবস্থায় অনেকেই তাদের প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রগতিতে হতাশা হয়ে পড়বেন!! তবুও বৈজ্ঞানিক গালভরাবুলি যে, তারা মহাশূন্যের রহস্যভেদ করেছে!!

চিন্তাকরুন সৃষ্টির অন্যান্য বিষম সৃষ্টির তুলনায় মানুষ কত ক্ষুদ্র, নগন্য। তাই ইয়োবের কাছে ঈশ্বরের উক্তি যথার্থ

> *"রাশিগণকে কি স্ব স্ব ঋতুতে চালাইতে পার? স্বাতি ও তৎপুত্রগণকে পথ দেখাইতে পার? তুমি কি আকাশমন্ডলের বিধান কলাপ জান? পৃথিবীতে তাহার কর্তৃত্ব নিরূপন করিতে পার"?* (ইয়োব ৩৮ঃ৩২-৩৩)।

জোর্তিবিজ্ঞানীগন নিশ্চিত করেছেন যে, আকাশমন্ডলের এই দৈত্যকায় সৌরপ্রণালী (ইংরেজী অথো: কিং জেমস ভার্সনে যার নামকরন আছে Arcturus এবং যার বাংলা অনুবাদ করা হয়েছে স্বাতী) যেটা আমাদের দেখা সূর্যের তুলনায় কমপক্ষে প্রায় এক লক্ষ মিলিয়ন গুন আয়তনে বড় এবং আমাদের পৃথিবীর প্রায় এক লক্ষগুন বেশী আয়তনে বড় আমাদের সূর্য। ঐ 'আরক্টারাস' নামক সৌর প্রণালীটিরও বিভিন্ন গ্রহ ও উপগ্রহ আছে (যাদেরকে 'ইয়োবের' পুস্তকে সৌরটির 'পুত্রগুন' বলে ক্যাবিকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে) যারা ঘন্টায় চৌদ্দশত হাজার কিলোমিটার বেগে মহাশূন্যে দৌড়ে চলেছে, অতিনিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, মানুষের পক্ষে অকল্পনীয় হারের এই বেগকে ভারসাম্য রাখার পেছনে অবশ্যই কোন মহাশক্তি বা সর্বশক্তিমানের হাত কাজ করছে। এই প্রসঙ্গে গীত রচয়ক অতীব সত্য উক্তি করেছেন,

"আমি তোমার অঙ্গুলি-নির্মিত আকাশ-মন্ডল, তোমার স্থাপিত চন্দ্র ও তারকামালা নিরীক্ষণ করি, [বলি,] মর্ত্য কি যে, তুমি তাহাকে স্মরণ কর?" (গীতসংহিতা ৮:৩-৪) গীতসংহিতা ৮:১ আরও বলে *"হে সদাপ্রভু, আমাদের প্রভু, সমস্ত পৃথিবীতে তোমার নাম কেমন মহিমান্বিত। তুমি আকাশমন্ডলের উর্ধেক্ষও তোমার প্রভা সংস্থাপন করিয়াছ"*।

অথচ এই অসীম ক্ষমতাবান ঈশ্বর তাঁর অপার করুণায় মানুষের সঙ্গে অপূর্ব এক সেতুবন্ধন তৈরী করেছেন, পিতৃত্বের মমত্বে মানুষকে বাঁধতে চেয়েছেন যেন মানুষ তাঁর গৌরব ও মহিমা প্রকাশে রক্ষা পায়। তাইতো গীত রচয়িতা আমাদের আশ্বাস দিয়ে বর্ণনা করেছেন,

"কারণ পৃথিবীর উপরে আকাশমন্ডল যত উচ্চ, যাহারা তাঁহাকে ভয় করে, তাহাদের উপরে তাঁহার দয়া তত মহৎ। পশ্চিমদিক্ হইতে পূর্বদিক্ যেমন দূরবর্তী, তিনি আমাদের হইতে আমাদের অপরাধ সকল তেমনি দূরবর্তী করিয়াছেন। পিতা সন্তানদের প্রতি যেমন করুণা করেন, যাহারা সদাপ্রভুকে ভয় করে, তাহাদের প্রতি তিনি তেমনি করুণা করেন। কারণ তিনিই আমাদের গঠন জানেন; আমরা যে ধূলিমাত্র, ইহা তাঁহার স্মরণে আছে। কিন্তু সদাপ্রভুর দয়া, যাহারা তাঁহাকে ভয় করে, তাহাদের উপরে অনাদিকাল অবধি অনন্তকাল পর্যন্ত থাকে; এবং তাঁহার ধর্মশীলতা পুত্র পৌত্রদের প্রতি বর্তে, তাহাদের প্রতি, যাহারা তাঁহার নিয়ম রক্ষা করে, ও তাঁহার বিধি সকল পালনার্থে স্মরণ করে। সদাপ্রভু স্বর্গে আপন সিংহাসন স্থাপন করিয়াছেন, তাঁহার রাজ্য কর্তৃত্ব করে সমস্তের উপরে" (গীত ১০৩:১১-১৪ পদ, ১৭-১৯ পদ)।

মানুষ যখন উর্দ্ধে কিছু দেখতে চায় (When man looks up)

সত্যিকার অর্থে মানুষ যখন স্বর্গ পানে দৃষ্টি তুলে ধরে তখন সে মহান সৃষ্টিকর্তার অতীব আশ্চর্যময় মহিমা অবলোকন করে, এ সম্পর্কে বাইবেলের বক্তব্য *"তিনি... অবস্তুর উপরে পৃথিবীকে ঝুলাইয়াছেন"* (ইয়োব ২৬:৭)। আমরা কি কখনও চিন্তা করেছি যে, আমাদের এই গোলার্ধের ওজন বৈজ্ঞানিকগণ নির্ধারিত করেছে ৬,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০ টন, এই বিষম ভারী বস্তুটিকে ঈশ্বরের অবর্ণনীয় শক্তিবলে (যাকে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে) প্রতি সেকেন্ডে ২৯.৭ কিলোমিটার বেগে শূন্যে আবর্তিত হচ্ছে, যুগ যুগান্ত ধরে কোনরকম অঘটন ছাড়াই। এই গতিবেগের কাছে বিশ্বের সবথেকে দ্রুত জেট বিমানের গতি একেবারেই নগন্য। কখনও কি আমরা মনোযোগ দিয়ে চিন্তা করেছি, মহাশূন্যে অবস্থিত প্রতিটি গ্রহ, উপগ্রহ নক্ষত্র, নক্ষত্ররাজি যার যার নির্দিষ্ট স্থান থেকে প্রবল গতিতে প্রদক্ষিত হচ্ছে, আর লক্ষ, কোটি দূরবর্তীস্থান পৃথিবীর বুকে বসে জ্যোর্তিবিজ্ঞানীগণ তাদের অবস্থান, আচরণ সম্পর্কে ভবিতব্য করার মিথ্যা প্রয়াস চালাচ্ছেন, যাদের খুব সংখ্যককেই পৃথিবী থেকে দেখা সম্ভব।

এখনও কি আমরা বলবো এইরকম চমৎকৃত নির্ভূল পরিণামদর্শিতায় চালিত বস্তুগুলি কোন মহান সৃষ্টি না অকস্মাৎ প্রবর্তিত?

আমাদের এই বিশাল পৃথিবী, যেটা কিনা সূর্যের তুলনায় অতি ক্ষুদ্র, যদিও সূর্যকে দেখতে মনে হয় একটি ছোট্ট গোলাকার জ্বলজ্বলে ডিস্কের মত, কারণ পৃথিবী অসীম সীমাহীন দূরত্বে অবস্থানের কারনে।

সূর্যের সবথেকে চমৎকৃত ব্যাপারটি হচ্ছে কি আশ্চর্য্যভাবে এর রশ্মি পৃথিবীতে এসে পৌঁছেচ্ছে ৩০০,০০০ কিলোমিটার বেগে প্রতিসেকেন্ডে মহাশূন্যকে ভেদ করে পৃথিবীর মাটিতে এসে বিচ্ছুরিত হচেছ, সেটাতে গাছপালা সজীব হচ্ছে, প্রতিটি ঘাসের কণা, পশু পাখী, মানুষ সূর্যতাপে সবলতা পাচ্ছে, সূর্যতাপ পশু, পাখীর গৃহপালিত জীবের শরীরে প্রবেশ করে তারা যে ঘাস বা অন্যান্য খাদ্য খায় তা হজমে শক্তি যোগাচ্ছে যার ফলে আমরা দুধ, মাংস, ডিম খেতে পারছি, উল, চামড়া প্রসেস করে পরনের কাপড়, অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস বানাচ্ছি। সৃষ্টির কি অপূর্ব দান! মানুষের প্রতি ঈশ্বরের এইসব মহিমাময় কল্যাণকরের জন্য আমাদের ঈশ্বরকে প্রাণ খুলে ধন্যবাদ, প্রশংসা করার সাথে সাথে ক্রমবিবর্তনবাদীদের জন্য পরামর্শ দেওয়া উচিৎ (২য় পিতর ২:২২)।

পৃথিবীর মানুষ, পশুপাখী, জীবজন্তু, গাছপালা অর্থাৎ পৃথিবীস্থ প্রতিটি প্রাণের স্বাস্থ্যের প্রয়োজনে বা স্বার্থরক্ষায় এবং ঘোর অন্ধকারকে আলোকময় করতে সূর্যরশ্মি বা কিরন বিচ্ছুরন করা ছাড়াও যীশু খ্রীষ্টের প্রকৃষ্ট প্রতীক হিসেবে বিবেচ্য হয় সূর্য। যীশু তাঁর শিষ্যদের বলেছিলেন, *"আমি জগতের জ্যোতি"* (যোহন ৮:১২)।

শুধুমাত্র যারা তাঁর পথ অনুসরন করবে তাদের জীবনই একমাত্র আলোকিত হবে তা নয়, যীশু এই জগত থেকে কুসংস্কার এবং আত্মিক অন্ধকারও ধ্বংস করবে যা কিনা মানবজাতিকে অধোঃপতনে নিয়ে যায়, ঈশ্বরের প্রতাপ প্রসারে বাধ সাধে, এ সম্পর্কে যিশাইয়, যীশুর পুনরাগমন সম্পর্কে গীত রচয়ক বর্ণনা করেছেন,

> *"তাঁহার নাম অনন্তকাল থাকিবে; সূর্যের স্থিতি পর্যন্ত তাঁহার নাম সতেজ থাকিবে; মনুষ্যেরা তাঁহাতে আশীর্বাদ পাইবে; সমুদয় জাতি তাঁহাকে ধন্য ধন্য বলিবে"* (গীতসংহিতা ৭২:১৭)।

আমরা যখনই আকাশের দিকে দৃষ্টি দিই, ঈশ্বরের অসীম ক্ষমতায় সৃষ্ট বিভিন্ন সৃষ্টি ছাড়াও আমাদের প্রতি তাঁর করুনার অপার নিদর্শন দেখতে পাই, এসবকিছুই ব্যক্ত করে মহৎ সৃষ্টির মতই এ পৃথিবীকে নিয়ে, ঈশ্বরের মহৎ উদ্দেশ্যের বিষয় যে সম্পর্কে দানিয়েল ভাববাদী তাঁর পুস্তকে বর্ণনা করেছেন,

"আর সেই রাজগণের সময়ে স্বর্গের ঈশ্বর এক রাজ্য স্থাপন করিবেন, তাহা কখনও বিনষ্ট হইবে না, এবং সেই রাজত্ব অন্য জাতির হস্তে সমর্পিত হইবে না; তাহা ঐ সকল রাজ্য চূর্ণ ও বিনষ্ট করিয়া আপনি চিরস্থায়ী হইবে" (দানিয়েল ২:৪৪)।

ঈশ্বরের এই উদ্দেশ্য পূরণ কল্পে ঈশ্বর জগতের জ্যোতি হিসেবে খ্রীষ্টকে এই পৃথিবীতে পুন: প্রেরণ করবেন (প্রকাশিতবাক্য ১:৭)।

আকাশে অবস্থিত প্রতীক সমুহ (Symbols in the Sky)

সূর্যের আগুন কখনও নিঃশেষ হবে না, সৃষ্টি থেকেই এই আগুন জ্বলছে, এই অর্ণিবান শিখা সূর্য যতদিন থাকবে একইভাবে অবিরত জ্বলবে, ধারনা করা হয় সূর্যের কিনারাতে এই আগুনের উত্তাপ হচ্ছে ৬-৭ হাজার ডিগ্রী এবং ভিতরের উত্তাপ প্রায় ৫০ মিলিয়ন ডিগ্রী। পৃথিবী এই উত্তাপের খুবই সামান্য ডিগ্রী গ্রহণ করে। যদি পৃথিবী বর্তমান দূরত্বের তুলনায় আরও কম দূরত্বে অর্থাৎ সূর্যের আরও কাছাকাছি অবস্থান করতো তাহলে সূর্যের উত্তাপে সবকিছুই ধ্বংস হয়ে যেত। সৃষ্টিকর্তার কি অসীম বিচক্ষনতা। এমনকি চন্দ্রের পরিবর্তে সূর্যের অবস্থান যদি চন্দ্রের স্থানে হতো, তাহলেও সেই অবস্থান পৃথিবীর জন্য হুমকি স্বরূপ হতো, ঈশ্বরের পরিনামদর্শিতা তা হতে দেয়নি, যিশাইয় ভাববাদী ৪৫:১৮ পদে

"কেননা আকাশমণ্ডলের সৃষ্টিকর্তা সদাপ্রভু, স্বয়ং ঈশ্বর, যিনি পৃথিবীকে সংগঠন করিয়া নির্মাণ করিয়াছেন, তাহা স্থাপনকরিয়াছেন, ও অনর্থক সৃষ্টি না করিয়া বাসস্থানার্থে নির্মাণ করিয়াছেন, তিনি এই কথা কহেন, আমিই সদাপ্রভু, আর কেহ নয়"।

ঈশ্বরের কর্মকান্ডের কাছে মানুষের কৃত সবথেকে উত্তম কর্মকান্ডকে খেলনাবস্তুর সাথে তুলনা করা যেতে পারে। একটি উদাহরন দেওয়া যেতে পারে, অষ্ট্রেলিয়ার সিডনী বন্দরে একদা প্রায় ৯০ মিটার ঘন গভীর কুয়াশায় আছন্ন হয়, যেটা বিতারিত হতে প্রায় ৫ মিলিয়ন টন বাতাসের ব্যবস্থা করেও মানুষ সেই কুয়াশা নিবারিত করতে পারেনি ২৪ ঘন্টা পরিশ্রম করার পরও। অথচ সূর্য রশ্মিতে মাত্র ১ ঘন্টা পরই সেই ঘন কুয়াশার নিরসন হয়। সূর্যরশ্মির সবথেকে বড়দান তাদ্বারা ঘোর অন্ধকার তাৎক্ষনিকভাবে দূরীভূত হয়।

বেশীরভাগ জ্যোর্তিবিজ্ঞানীগণ সূর্যের মহিমামন্ডিত বর্ণনা দিয়েছে। সূর্যের চারিপাশের কিনারাকে বলা হয় ফটোস্পেয়ার (Photosphere) কারণ এখান থেকেই পৃথিবীতে আলো বিচ্ছুরিত হয়। সাধারন দৃষ্টিতে দূর থেকে মনে হয় কিনারাগুলি খুবই স্বচ্ছ সমান, কিন্তু প্রকৃতরূপে কিনারাগুলি ঢেউ খেলানো আগুনের সমুদ্ররূপে আখ্যায়িত করা যেতে পারে। সূর্যের ফটোস্পেয়ারটি আসলেই মারাত্মক জ্বলন্ত অগ্নিকুন্ডের মত, মাঝে মাঝে অবর্ণনীয় হাইড্রোজেনের জ্বলন্ত শিখার ঝড় প্রবাহিত যার গতিবেগ ৩০০,০০০ কিলোমিটারেরও বেশী। কিনারা বা কোনের কাছাকাছি কিছু অত্যাধিক উজ্জ্বল স্থানকে বলে ফ্যাকুলিয়ে (Faculae), এই অংশগুলি দ্বারাই সূর্যের

সবথেকে উত্তম অংশ পরিপূর্ণ যাদের দৈর্ঘ্য কোন কোন সময় ৬৫,০০০ কিলোমিটার এবং ৬,৫০০ কিলোমিটার প্রস্থ হয়ে থাকে। ফটোস্পেয়ারের বাইরের পাশটি উলটে যায় বা রির্ভাসিং স্তর যেটি হিমঠান্ডা গ্যাস ধারন করে, তার উপরের স্তরটি ক্রমোস্পেয়ার (Chromosphere) অথবা 'রঙ্গীন স্তর' কারণ এটি দেখতে রক্তলাল গোলাপের পাপড়ীর মত লাল, এ স্তরটির গভীরতা প্রায় ৬,৫০০ কিলোমিটার। এ সকল স্তরের পরে হচ্ছে 'করোনা' (corona) নামক চমৎকার বরফের মত স্বচ্ছ সাদা অংশ, এটি একটি বিস্তৃত দূর্লভ বায়ুমন্ডল ধরা যেতে পারে যেটিতে দীর্ঘকায়, মসৃন, অসম্ভব উজ্জ্বল সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম তন্তুর মত অগ্নিকনা বিদ্যমান, যার নাম করন করা হয়েছে 'ষ্ট্রিমারস' (Streamers), এই সুক্ষ তন্তু কনাগুলির কোন কোনটি দৈর্ঘ্যে প্রায় ১৬ মিলিয়ন লম্বা হয়ে থাকে। সূর্যের এই গঠন রহস্যটি ১৮৭৮ খ্রী: যখন পূর্ণ সূর্যগ্রহণ সংগঠিত হয় সেই সময়ে করা বৈজ্ঞানিকদের ব্যাখা অনুযায়ী এখানে বর্ণনা করা হয়েছে।

পবিত্র বাইবেলে সূর্যকে পৃথিবীস্থ সকল প্রাণের সচলতার একমাত্র অখন্ডনীয় প্রয়োজনীয় উৎস হিসেবে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। গীতসংহিতা ১৯গীতে দায়ূদ সূর্যকে সৈন্য সামন্তের জেনারেল বীর হিসেবে ব্যাখা করেছেন, 'সূর্য' দায়ূদকে যীশু খ্রীষ্টের বরবেশে পৃথিবীতে পুনারাগমনের বিষয় স্মরণ করিয়ে দেয়।

"আকাশমণ্ডল ঈশ্বরের গৌরব বর্ণনা করে,তাহাদের মানরজ্জু সমস্ত পৃথিবীতে ব্যাপ্ত, তাহাদের বাক্য জগতের সীমা পর্যন্ত ব্যাপ্ত; তাহাদের মধ্যে তিনি সূর্যের নিমিত্ত এক তাম্বু স্থাপন করিয়াছেন। সে বরের ন্যায় আপন বাসরগৃহ হইতে নির্গত হয়, বীরের ন্যায় স্বীয় পথে দৌড়াইবার জন্য আমোদ করে। সে আকাশমণ্ডলের প্রান্ত হইতে যাত্রা করে, অপর প্রান্ত পর্যন্ত ঘুরিয়া আইসে; তাহার উত্তাপে কোন বস্তু লুক্কায়িত থাকে না"
(গীত ১৯:৪-৬)।

দায়ূদ ঈশ্বরের সকল অনন্তকালীন প্রতিজ্ঞা পরিস্ফুটনের কেন্দ্র। দায়ূদ এই সত্য মর্মে মর্মে উপলব্ধি করে বর্ণনা করেছেন ১১১ গীতের ২পদে

" সদাপ্রভুর কর্ম সকল মহৎ; তৎপ্রীত সকলে সেই সকল অনুশীলন করে"।

দেদিপ্যমান সূর্যের মহিমাময় রূপ, শক্তি অর্ণিবান উত্তাপ, বিচ্ছুরিত উজ্জ্বল আলো, নিয়ন্ত্রনের ক্ষমতা, জীবনের সজীবতা, সচলতার জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান প্রদানের ক্ষমতাসকল যীশু খ্রীষ্টের প্রতীক বলে ভাবা হয়। যীশুকে সূর্যের সাথে তুলনা করে ভাববাদী মালাখি বর্ণনা করেন, মালাখি ৪:২পদে

"কিন্তু তোমরা যে আমার নামে ভয় করিয়া থাক, তোমাদের প্রতি ধার্মিকতা- সূর্য (যীশুর পুনরাগমনে)উদিত হইবেন, তাঁহার পক্ষপুট আরোগ্যদায়ক"।

" তিনি প্রাতঃকালের, সূর্যোদয় কালের, মেঘরাহিত প্রাতঃকালের দীপ্তির ন্যায় হইবেন; যখন বৃষ্টির পরবর্তী তেজপ্রযুক্ত ভূতল হইতে নবীন তৃণ বহির্গত হয়" (২য় শমূয়েল ২৩:৪)।

"উঠ, দীপ্তিমতী হও, কেননা তোমার দীপ্তি উপস্থিত, সদাপ্রভুর প্রতাপ তোমার উপরে উদিত হইল। কেননা, দেখ, অন্ধকার পৃথিবীকে, ঘোর তিমির জাতিগণকে, আচ্ছন্ন করিতেছে, কিন্তু তোমার উপরে সদাপ্রভু উদিত হইবেন, এবং তাঁহার প্রতাপ তোমার উপরে দৃষ্ট হইবে। আর জাতিগণ তোমার দীপ্তির কাছে আগমন করিবে, রাজগণ তোমার অরুণোদয়ের আলোর কাছে আসিবে" (যিশাইয় ৬০:১-৩)।

"আর তুমি আমাকে যে মহিমা দিয়াছ, তাহা আমি তাহাদিগকে দিয়াছি; যেন তাহারা এক হয়, যেমন আমরা এক" (যোহন ১৭:২২)।

" ঈশ্বর, সদাপ্রভু ঈশ্বর কথা কহিয়াছেন,সূর্যের উদয়স্থান অবধি অস্তস্থান পর্যন্ত তিনি পৃথিবীকে আহ্বান করিয়াছেন। সিয়োন হইতে, পরম সৌন্দর্যের স্থান হইতে, ঈশ্বর দেদীপ্যমান হইয়াছেন" (গীতসংহিতা ৫০:১-২)।

"আর রাজত্ব, কর্তৃত্ব ও সমস্ত আকাশমণ্ডলের অধঃস্থিত রাজ্যের মহিমা পরাৎপরের পবিত্র প্রজাদিগকে দত্ত হইবে; তাঁহার রাজ্য অনন্তকালস্থায়ী রাজ্য, এবং সমস্ত কর্তৃত্ব তাঁহার সেবা করিবে ও তাঁহার আজ্ঞাবহ হইবে" (দানিয়েল ৭:২৭)।

সেই সময়ে সকলেই তাঁহার প্রশংসা ও আরাধনায় রত থাকবে, আর যারা করবে না তারা ধ্বংস হবে।

"কারণ যে জাতি বা রাজ্য তোমার দাসত্ব স্বীকার না করিবে, তাহা বিনষ্ট হইবে; হাঁ, সেই জাতিগণ নিঃশেষে ধ্বং-সিত হইবে" (যিশাইয় ৬০:১২)।

তাঁর আত্মিক আলোর ফল্গুধারাতে মনুষ্য দ্বারা সৃষ্টি যত জট যত অন্ধকার দূরীভূত হবে। কুসংস্কারের কুয়াশা কেটে স্বর্গীয় আলোর প্রবাহ বইবে, জাতিগন তোমার নিকটে আসিয়া বলিবে, হে সদাপ্রভু, আমার বল ও আমার দুর্গ এবং সঙ্কটকালে আমার আশ্রয়, আরও বলিবে,

"কেবল মিথ্যা বিষয়েও অসার বস্তুতে আমাদের পিতৃপুরুষদের অধিকার ছিল তাহার মধ্যে একটাও উপকারী নয়" (যিরমিয় ১৬:১৯)।

বিবর্তনবাদীদের অবস্থা মাছি ফাঁদে/জালে পড়ার মত
(The evolutionist caught in a fly trap)

ধরাযাক, বিবর্তনবাদীদের মতে বিভিন্ন জটিলতার অবস্থা পেরিয়ে তবে জীবনের অস্তিত্বধারন বা গঠন হয়েছে কারণ তারা অস্বীকার করে যে, জীবন বা প্রানের অস্তিত্ব কখনও প্রাকৃতিক নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায় সম্ভব নয়। ঈশ্বর তেমন কিছু উদাহরন প্রাকৃতিক ভাবে প্রবর্তিত করেছেন, আর ওদিকে বিবর্তনবাদীরা দাবী করে যে, পৃথিবীস্থ যতগুলি প্রাণীই বিভিন্ন স্তর পেরিয়ে জীবন লাভ করে তার পেছনে ঐশ্বরিক শক্তি কাজ করে না, তা একান্তই অকস্মাৎ ভাবে সে সব প্রাণীর ভাগ্যের বা অবস্থার পরিবর্তন ঘটে মাত্র, যেমন- রেশমপোকা, প্রজাপতি ইত্যাদি। তাদের এই

দাবীকে অবান্তর বিবেচনা করার আগে দেখা যাক একটি জলজ্যান্ত প্রাণের (গাছ) বিবরন দ্বারা, যে ঈশ্বরের শৈল্পিক হাতে গড়া। গাছটির নামকরন করা হয়েছে, "ভেনাস পতঙ্গ ফাঁদ" (Venus fly trap), যেটি আমেরিকার উত্তর কার্লিফোনিয়া অঞ্চলে দেখা যায়, সবসময়ই পতঙ্গ ফাঁদে ফেলতে উন্মুখ থাকে, নীচের অংকনের দ্বারা ফুলের বিভিন্ন অংশ দেখানো হয়েছে ও বোঝানো হয়েছে কিভাবে ফাঁদ কাজ করে, গাছটির পাতাগুলি মাটির উপরে আলাদা আলাদা ভাবে অলসভাবে বিছানো রয়েছে বলে মনে হয় (চিত্রের B1), প্রতিটি পাতার প্রান্তভাগটি ব্লেডের মত দেখতে, ধারালো শক্ত, কাজও করে মজবুত ফাঁদ হিসেবে। ফাঁদের প্রকৃত অংশটি মাঝখান থেকে চিড়ে দুভাগে বিভক্ত, ঠিক উপরে আর্কষনীয় সবুজ, গোলাপী, অথবা লাল রংয়ে রঞ্জিত হয়ে ফুলের আর্কষন বৃদ্ধি করে, ফাঁদটির উপরের স্তরে (অংকনটির C4 অংশ) ছোট্ট ছোট্ট সূক্ষ্ম চুলের মত পাতলা শুড়, যা দুপাশেই অবস্থিত এবং খুবই সংবেদনশীল, ফাঁদটির 'ট্রিগার' হিসেবে প্রতি পাশে ছয়টি করে মোট বারটি সংবেদনশীল শুড় কাজ করে। যদি কোন কীট পতঙ্গ ফুলে অবতরন করে, মধুর খোঁজে পাঁপড়ী বা আশ পাশ দিয়ে হাঁটতে থাকে, যখন পতঙ্গটি কোন ক্রমে কোন শুড়কে আঘাত করে, সাথে সাথে দু'পাশেরই শুড়গুলি একত্রিত হয়ে সাঁড়াশির আকার ধারন করে পতঙ্গটি এমনভাবে চেপে ধরে যে সেটির কোন পালাবার পথ থাকে না (অংকনটির E অংশ)। এমনকি এই অতি সংবেদনশীল শুড়গুলি জীবন্ত এবং অবস্থার পার্থক্য নির্ণয় করতে পারে। এই ফাঁদ পাতা বা শুড়গুলির কাজ বা চাপ ততক্ষন পর্যন্ত শেষ/বন্ধ হবে না যতক্ষন পর্যন্ত না মুখোমুখি অবস্থিত দুটি শুড় অথবা একটি শুড়ই কয়েকবার চোষার কাজে রত থেকে জীবন্ত কীট পতঙ্গের মৃত্যু নিশ্চিত করবে, এ সময় অন্যান্য অংশ বা ছোট ছোট পাঁপড়ী সেই ফাঁদের কাজ চালিয়ে যাওয়ায় কোন বাধাস্বরূপ হবে না।

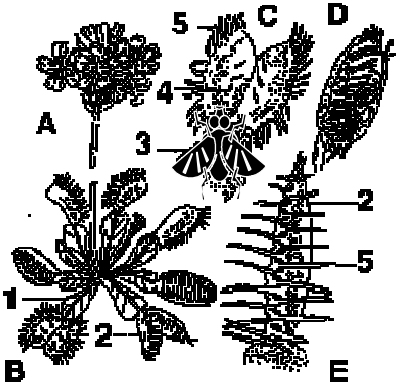

A -- ফুল
B -- গাছ
C,D,E – কিভাবে ফাঁদটি কাজ করে।
1. পাতাগুলি ব্লেডের মত দেখতে ফাঁদের মত।
2. ফাঁদ।
3. পাতাতে পতঙ্গ।
4. সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ধারালো শুড় বা চুলের মত।
5. দাঁত বা শুড়গুলি বন্ধ হয়ে সাঁড়াশি বা ফাঁদ হিসেবে কাজ করে।

পতঙ্গ, কীট আটকাবার ভেনাস ফ্লাই ট্র্যাপ 'গাছ'

একবার ফাঁদটি যখন সাঁড়াশির মত বন্ধ হয় তখন তার শিকারের মৃত্যু নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত শক্ত থেকে শক্ততর পুন: পুন: চাপ দিতে থাকে, একসময় ফাঁদের মধ্যস্থিত স্তর হতে পাচকরস নির্গত হয়, এই ফাঁদগুলি কীটপতঙ্গের নরম শরীরকে চূর্ণ করার মত শক্তি রাখে, যতক্ষন পর্যন্ত না পতঙ্গটি ফাঁদ দ্বারা গাছের খাদ্যে পরিণত হয়ে পাচক রসে মিশ্রিত না হয় ততক্ষন পর্যন্ত "ভেনাস ফ্লাই ট্র্যাপের" কাজ চলতে থাকে, একসময় ফাঁদ আবারও পূর্বের স্থান ধারন করে পরবর্তী শিকারের জন্য নিজেকে প্রস্তুত রাখে। এই গাছটির প্রতিটি অংগ একক বৈশিষ্ট ধারন করে অথচ নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্যে প্রয়োজনে প্রত্যেকটি আলাদা আলাদা অংগ সহযোগী হয়ে কাজ করে, এরকম পরিকল্পিতভাবে সৃষ্টি, কি বুদ্ধিমান সৃষ্টিকর্তা ছাড়া সম্ভব? আবারও গাছটির ফাঁদপাতার পদ্ধতি এবং হাতিয়ার অংগ সম্পর্কে বিবেচনা করা যাক, দুটি পাতা, মাঝখানে চিড়ের মত, দাঁতের মত কোনা কোনা অংশ, শুড় জাতীয় অংশ, পরিপাক তন্ত্র, সঠিক সময়ে তড়িৎ গতিতে পাচকরস বা অম্ল উৎপাদনের ক্ষমতা, শুধুমাত্র কীটপতঙ্গকেই নিজেদের খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করার জন্যেই গাছটি ফাঁদ হিসেবে কাজ করে। কিভাবে কোন আকস্মিক চ্যান্সে এত সুসংগঠিত সৃষ্টি সম্ভব? বিবর্তনবাদীরা এই "ভেনাস ফ্লাই ট্র্যাপ" গাছটির জন্ম বা উদ্ভব সম্পর্কে কোন সঠিক তথ্য প্রদানে ব্যর্থ হয়ে নিজেরাই নিজেদেরকে "ফ্লাই ট্র্যাপের" মত ফাঁদে আটকে ফেলেছে।

অন্যভাবে চিন্তা করা যাক, "ফ্লাই ট্র্যাপ" গাছটির প্রতিটি অংগের উদ্ভব হতে সময় লেগেছে লক্ষ লক্ষ বছর অথবা ঈশ্বরের সৃষ্টি পরিকল্পনায় সৃষ্টি হয়েছে! বিবর্তনবাদীদের দাবী মতে গাছটির প্রতিটি অংগ একটি একটি করে গজাতে বা প্রকাশ হতে লক্ষ বছর সময় লেগেছে, কিন্তু প্রতিটি অঙ্গ একবারে গঠিত না হলে গাছটির ফাঁদ কাজ করতে পারবে না আর ফাঁদ কাজ না করতে পারলে গাছের জন্য খাদ্যের ব্যবস্থা হবে না, একদা খাদ্যের অভাবে গাছটির মৃত্যু হবে, আরো একটু মজা করে বলা যায় সৌভগ্যবশত: গাছটির কোন মস্তিক থাকলে যদি লক্ষ বছর সময় ধরে তার প্রতিটি অংগ বা অংশ গজাতে সময় লাগে তাহলে অবশ্যই গাছটি হতাশাগ্রস্থ হয়ে চিকিৎসকের আশ্রয় নিতো অথবা নিজেই নিজেকে হত্যা করতো!! অনুগ্রহ পূর্বক পাঠকবৃন্দ আমাদের এই মজা করাটাকে ক্ষমাসুন্দর চোখে দেখবেন, কিন্তু বিবর্তনবাদীদের এই অমুলক দাবীকে আমরা কিভাবেই বা ব্যাখা করতে পারি? এই নির্দিষ্ট ধরনের "ভেনাস ফ্লাই ট্র্যাপ" (উত্তর আমেরিকার কার্লিফোনিয়া অঞ্চলে সচরাচরই দেখা যায়)। গাছটি একমাত্র সুকল্পিত ভাবে সৃষ্টি হয়ে জন্মাতে পারে। আবারও গাছটির চিত্র লক্ষ্য করা যেতে পারে, গাছটির ফুল এর ফাঁদ থেকে আলাদা, যেটার অবস্থান গাছটির পাতার একবারে প্রান্তভাগে। এই গাছটির অংগ, প্রত্যঙ্গ বা বৈশিষ্ট্যের বা পাতার আকারেরও পরিবর্তীত করা সহজ নয়, এমনকি গাছটির ফুলও কোন পরিবর্তন আনতে পারবে না, পরিবর্তন সম্ভব প্রকৃত গাছটির উত্তরসূরীর মধ্য দিয়ে, আর বীজ থেকেই এর উত্তরসুরী জন্মায়, এখন হয়তো বিবর্তনবাদীরা বলবে যে, মনে হয় বীজের মধ্যেই বিবর্তনবাদ সংঘটিত হতে পারে। আমাদের কারো কারো হয়তো মনে হতে পারে একটি

গাছকে নিয়ে এত কেচ্ছাকাহিনীর কি দরকার? সুধী, পাঠকদের বোঝাবার জন্যে যে, বৈজ্ঞানিকরা কিরকম ভিত্তিহীন তথ্য সাধারন মানুষকে বিশ্বাস করতে প্রলোভিত করে।

গাছটির মাইক্রোসকোপিক কোষ যা থেকে বীজ জন্ম নেয়, সেই কোষটিও বিচিত্র ধরনের, অনেক জটিল ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদার্থ এই কোষে বিদ্যমান, সবথেকে প্রয়োজনীয় অংশ হচ্ছে জীন্‌স ও ক্রমোসোমস, প্রোটিনের ক্ষুদ্র ফিতার আকারের এবং নিউক্লীকএ্যাসিডস (Tiny ribbons of protein and nucleic acids) যারা মিলিত হয়ে জন্মাবার এবং বংশগত বৈশিষ্ট্যের নিশ্চিত করে এবং এইভাবে গাছটির আকারগতধরন ও কাজের ধরন স্থিরীকৃত হয়, সে রহস্য বীজের মধ্যেই লুক্কায়িত থাকে। আর শুধুমাত্র "প্রাকৃতিক শক্তি"ই কোষটির বৃদ্ধি বা প্রয়োজনীয় ক্ষুদ্র ফিতার আকারের প্রোটিনকে অবিরতভাবে জলীয় পদার্থ সরবরাহ করে উত্তোলিত রাখতে সাহায্য করে কারণ যখন লক্ষ লক্ষ কোষ পুন: উৎপাদিত হয়, তখনও যেন গাছটির বংশগত বৈশিষ্ট্য একইরকম অর্থাৎ গাছের প্রতিটি পাতার আকার, হুলবিশিষ্ট শুড় রং ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্য যেন একইরকম থাকে যাতে করে "ভেনাস ফ্লাই ট্র্যাপ" সেই পাতার সাহায্যে খাদ্যরূপ শিকার (কীট, পতঙ্গ অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সৃষ্ট প্রাণী) ধরতে পারে।

অবশ্যই বিবর্তনবাদ তত্ত্ব সত্য ও যথার্থকে নৈরাশ্য করে অবাস্তবকে প্রতিষ্ঠিত করে, কিন্তু তার থেকেও মহাসত্য যে, এই তত্ত্ব মহান সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের সৃষ্টিতত্ত্বকে অবজ্ঞা করে, অস্বীকার করে আমাদের চারিপাশের আশ্চর্য শক্তিতে নিয়ন্ত্রিত বিশাল প্রাকৃতিক ঘটনাসমূহ। অবশ্য এটাও লক্ষ্যনীয় বিষয় যে, প্রকৃতির পার্থক্যগত পরিবেশভেদে মানুষের জীবন বা জীবনযাত্রারও পার্থক্য ও পরিবর্তন কি হয়ে থাকে না? ইন্টারব্রিডিং বা উন্নত প্রজনন পদ্ধতির দ্বারা কি উন্নতজাতের পশুপাখী, শস্যাদি ফলন সম্ভব হচ্ছে না? অবশ্যই তা হয় কিন্তু এই পদ্ধতিতে ছাগলকে গরুতে পরিবর্তীত করা বা ধান গাছে গম ফলানো সম্ভব নয়, বস্তুত বিবর্তনবাদীরা এই দাবীই করছে। পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে, যে কোন উন্নত জাতের পশুপাখীকে ব্রিডিং করা না হলে সে তার পূর্বাবস্থায়ই ফিরে যাবে।

মানুষের দেহের চমৎকারীত্ব (The Marvel of Man)

মানবীয় শরীর একটি অতীব আশ্চর্যময়, জটিল জীবন্ত যন্ত্রকৌশলে পূর্ণ। হৃৎপিন্ড, রক্তপ্রবাহ, ফুসফুস এবং অন্যান্য সব অঙ্গ প্রত্যঙ্গ একটি মানুষকে জীবন্ত রাখতে একত্রে প্রতিনিয়ত কাজ করে চলছে, এতই নিখুঁত ভাবে এগুলো কাজ করে যে কোন দূর্ঘটনা বা কোন কারনে অবচেতন হয়ে না পড়লে আমরা এই অঙ্গগুলির গুরুত্ব সম্পর্কে অজ্ঞ থাকি। মানুষের জীবনের এই প্রয়োজনীয় অংগগুলি সত্যিই কি কোন জলাধারের কিনারার এঁটেলমাটি দিয়ে তৈরী হয়ে যার যার অবস্থানে থেকে যার যার কাজ করে চলছে? পবিত্র বাইবেলের শিক্ষা মানুষকে ঈশ্বরের মহিমা ও গৌরব প্রকাশের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছিল তাই মহান ঈশ্বরের অলৌকিক মহিমাও মানুষের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছিল। দুর্ভাগ্য বশত: মানুষের মূর্খতা ও ধৃষ্টতার কারনে সেই

অলৌকিক মহিমা ধারন ক্ষমতারহিত হয়। মানুষের আশ্চর্যময় শরীরের একটি উদাহরন দেওয়া যেতে পারে এখানে কি অভাবনীয় পদ্ধতিতে মনুষ্য শরীর দুটি চক্ষুর দ্বারা আলো গ্রহণ করছে। বিজ্ঞান শিক্ষা দেয় আলো হচ্ছে যে কোন উজ্জ্বল আলোকবস্তু (যেমন সূর্য) দ্বারা সৃষ্ট বা সঞ্চারিত ইথারের মধ্যদিয়ে একরাশ তরঙ্গ যেটা আলোর অভিমুখে উপর নীচ কম্পন সহকারে চলাচল করে।

আলো তৈরী হয় বিভিন্ন তরঙ্গ গুচ্ছের সমন্বয়ে, সূর্যের আলো পতিত বৃষ্টিতে প্রতিফলিত হয়ে রংধনুর সৃষ্টি হয়। এ তরঙ্গ গুচ্ছগুলি তাদের নির্দিষ্ট রং বা আভার কারনে আকারেও ভিন্ন হয়ে থাকে, অবশ্য গড়পড়তায় তাদের আকার প্রায় ০.০০০৪২ হয়ে থাকে। চোখের দ্বারা আমরা দৃশ্যতঃ আলোর যে রংয়েরচ্ছটা অবলোকন করে থাকি তাতে আমরা সকলেই মুগ্ধ হই, আর তা সম্ভব হয় রেটিনার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ঝিল্লী বা পর্দার কারনে, যেটা হচ্ছে অপটিক নার্ভেরই সম্প্রসারিত অংশ, চোখের পেছনের দিককার স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে অবস্থান করে। যদিও মাত্র ০.৩১৭৫ মিলিমিটার পুরু কিন্তু প্রায় দশটি স্তরের সমন্বয়ে এটি গঠিত এবং প্রতিটি স্তরই ০.৩১৭৫ পুরু বা গভীর হয়ে থাকে। প্রতি সেকেন্ডে এই আলোর গতি ৩০০,০০০ কিলোমিটার, যখন আমরা বেগুনি রংয়ের কোন ফুলের দিকে দৃষ্টি দিই (বেগুনি রংয়ের তরঙ্গ খুবই কম), রেটিনার কম্পনের হার হয় অত্যাধিক, ৭৫০,০০০,০০০,০০০,০০০ প্রতি সেকেন্ডের কম্পন।

এক্ষনে আমরাও গীত রচয়িতার সঙ্গে সুর মিলিয়ে বলতে পারি,

> *"আমি তোমার স্তব করিব, কেননা আমি ভয়াবহরূপে ও আশ্চর্যরূপে নির্মিত; তোমার কর্ম সকল আশ্চর্য, তাহা আমার প্রাণ বিলক্ষণ জানে"* (গীত ১৩৯:১৪)।

মানুষের শরীরের শুধুমাত্র একটি অঙ্গের (চক্ষুদ্বয়ের রেটিনা) অতি অপূর্ব শৈলী ও কার্যের দ্বারাই ধারণা করা যায় মহান সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের সীমাহীন ক্ষমতার বিষয়ে অর্থাৎ রেটিনা নামক প্রাণবন্ত বস্তু যেটা কিনা মানুষের তৈরী ঘড়ির যান্ত্রিক শৈলী থেকে ৭৫০ বিলিয়নের বেশী বার, বেশী মানের সূক্ষ্ম। একমিনিটে রেটিনার যে কম্পন সৃষ্টি হয় সেই সমপরিমান টিক করতে একটি ঘড়ি প্রায় ২২ বছর সময় নেবে। তবুও

> *"মূঢ় মনে মনে বলিয়াছে, 'ঈশ্বর নাই'"* (গীত ১৪:১)।

বিবর্তনবাদের সূত্র ও তাতে বিশ্বাসকারীদের ক্ষেত্রে সর্বতোভাবে প্রযোজ্য, তাদের ধারণায় কোন অতি প্রাকৃতিক (ঈশ্বর ছাড়া) আকস্মিক ঘটনার প্রভাবে মানুষের সবরকম চমৎকারীত্বই বাস্তবে রূপ নেয়।

মৌমাছির বিষাক্ত হুলে বিবর্তনবাদীরা আক্রান্ত
(The Evolutionist stung by a bee)

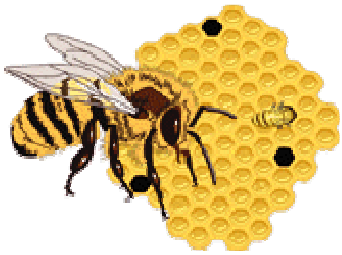

মৌমাছির চাকটিতে কি চমৎকার মোমের মত কোষগুলির বিষয়েই ভাবা যাক। মানুষের মত উন্নত মস্তিষ্কবিহীন ছোট্ট একটি প্রাণী তার স্বভাবগত প্রক্রিয়ায় কোনরকম ছেদ ছাড়াই কি নিখুতভাবে চাকের ষড়ভূজ বা কোণ আকৃতি তৈরী করে চলছে। এক বার একটু চেষ্টা করে দেখুন না? স্কেল বা জ্যামিতিক বক্সেও চৌক্যটি ছাড়া মৌমাছির মত নিখুঁত ষড়ভূজ বা ষড়কোণ আঁকতে পারেন কিনা? আমাদের কারোর পক্ষেই তা সত্যিই অসম্ভব। তথাপি মৌমাছিটি কোন প্রশিক্ষন, সাহায্যকারী ছাড়াই তা সম্ভব করে চলছে!! কিভাবে?

এছাড়া প্রতিটি মধুচক্র দুটি সেট কোষ দ্বারা গঠিত, প্রতিটিরই সম্মুখভাগটি খোলা, দৃশ্যতঃ কোষগুলির কোনটিই একে অপরের বিপরীতে অবস্থান করে না, যাহোক, প্রতিটি কোষের মধ্যভাগ অপরদিকে অবস্থিত তিনটি কোষের সন্ধিকোণের প্রান্তের গা ঘেষে অবস্থিত হওয়ার কারনে, এই নিপূন পদ্ধতি প্রতিটি কোষকে বিভক্ত রাখতে সাহায্য করে। অথচ এই বিভক্তকরন রেখা সমান্তরাল না কিন্তু মূলতঃ তিনটি ভূমির আকার সৃষ্টি করে একে অপরের সাথে একটি নির্দিষ্ট কোণে মিলিত হয়, যাতে করে কোষটির কেন্দ্র বা মধ্যভাগটিতে গভীর খাদের মত মনে হয়। আরও একটি বিষয় প্রমানিত হয়েছে যে, মৌমাছিগন যে কোণগুলি তৈরী করে সেগুলি যথাক্রমে ১০৯.২৮ এবং ৭০.৩২ পরিমাপের। গনিতবিদ কয়িং (Koing) সূক্ষ্ম হিসাব নিকাশ করে মন্তব্য করেন যে, সর্বউত্তম কোণের পরিমাপ হওয়া উচিৎ ১০৯.২৬ এবং ৭০.৩৪। দেখা যাচ্ছে মানব বিজ্ঞানীদের হিসাবমতে কোণের পরিমাপের সাথে ক্ষুদ্র প্রাণী মৌমাছিদের তৈরী কোণের পরিমাপের পার্থক্য মাত্র ০.২ ডিগ্রী অথবা একটি বৃত্তের $^{১}/_{১০,৮০০০}$ অংশ মাত্র।

তাহলে কি জ্যামিতিক অথবা গানিতিক বিদ্যা ভুল নাকি মৌমাছিরা তাদের কোণ রচনায় এক মিনিটের তরে কিছু ভুল করে চলছে? পুনরায় গনিতবিদরা সর্তকভাবে পরিমাপের পরীক্ষা নিরিক্ষার ফলে চুড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌছাঁলো। স্কটিশ গনিতবিদ ম্যাক্লারইন (MacLaurin) মন্তব্য করেন, পূর্ববর্তী গনিত বিদের পরিমাপটি সঠিক নয় কারণ সেটাতে মুদ্রন বা ছাপার ভুলজনিত কারনে সঠিক সংখ্যার স্থানে ভুল সংখ্যার উল্লেখ হয়, আসল পরিমাপটি হচ্ছে, একটি ডিগ্রীর ২ মিনিট অর্থাৎ মৌমাছিদের পরিমাপ সঠিক, গানিতিকগনের পরিমাপ ভুল!! শান্তমস্তিকে একবার চিন্তা করা যাক, শ্রেষ্ঠ মানুষের তুলনায় একরকম বলতে গেলে অবহেলিত অবুঝ এই জীবটি মানুষকে টেক্কা দেবার মত জ্ঞান কোত্থেকে অর্জন করেছে? এমনকি ডারউইন পর্যন্ত বিস্মিতের হুলে (না মৌমাছিদের নয়) স্তব্ধ হয়ে মন্তব্য করেছে, "মৌমাছিদের অতুলনীয় মধুরচাক সম্পর্কে আমাদের বলার কিছু নেই-----।"

বিবর্তনবাদীরাই ঈশ্বরের প্রজ্ঞা প্রকাশ/উন্মোচিত করেছে (The Evolutionist Reveals God's Wisdom)

অনেকটা অযাচিতভাবে বিবর্তনবাদীরা মহান ঈশ্বরের অতুলনীয় প্রজ্ঞার বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়েছে, কারণ বিগত দিনগুলিতে তাদের প্রদত্ত মতবাদের প্রভাব খুব স্পষ্টভাবেই ঈশ্বরের বাক্যের ঘোষনা দেয়,

> *"প্রথমে ইহা জ্ঞাত হও যে, শেষকালে উপহাসের সহিত উপহাসকেরা উপস্থিত হইবে; তাহারা আপন আপন অভিলাষ অনুসারে চলিবে, এবং বলিবে, তাঁহার আগমনের প্রতিজ্ঞা কোথায়? কেননা যে অবধি পিতৃলোকেরা নিদ্রাগত হইয়াছেন, সেই অবধি সমস্তই সৃষ্টির আরম্ভ অবধি যেমন, তেমনই রহিয়াছে। বস্তুতঃ সেই লোকেরা ইচ্ছাপূর্বক ইহা ভুলিয়া যায় যে, আকাশমণ্ডল, এবং জল হইতে ও জল দ্বারা স্থিতিপ্রাপ্ত পৃথিবী ঈশ্বরের বাক্যের গুণে প্রাক্কালে ছিল"* (২য় পিতর ৩:৩-৫)।

এই পদটি পরিস্কারভাবে ব্যক্ত করে যে, এই জগতের লোকেরা ঈশ্বরকে ইচ্ছাকৃতভাবে ভুলে থাকবে, অস্বীকার করবে তাঁর সৃষ্টিমাহাত্ব। জনপ্রিয় মতবাদ হিসেবে ব্যপক প্রাধান্য পাওয়া বিবর্তনবাদ বা সৃষ্টির ক্রমবিকাশ তত্ত্ব অজান্তে বাইবেলের ভবিষ্যৎবানীর সত্যতা প্রকাশ করছে। এ সম্পর্কিত বিষয়টি কি চমৎকার নয়। যে সর্বজ্ঞ ঈশ্বর বহু পূর্বেই এই বিষয়ে ভবিষ্যৎবানী করেছেন, যা আজকের পৃথিবীতে সত্যতায় পর্যবসিত হচ্ছে? এই ভবিষ্যৎবানীটিতে "শেষকাল" বলতে বোঝায় খ্রীষ্টের পুনরাগমনের পূর্বকালে সুতরাং সৃষ্টিতত্ত্বের অপপ্রচার প্রতিষ্ঠিত হওয়াটাই প্রমান করছে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমনের সন্ধিক্ষন।

আমাদের সকলেরই প্রয়োজন পবিত্র শাস্ত্রের বিভিন্ন ভাববাদীদের চিরসত্য ভাববানীতে মনোযোগী হওয়া এবং বিবর্তনবাদের মত ভ্রষ্টনীতিতে যারা বিশ্বাসী যারা নিজেদেরকে জাগতিক জ্ঞানে সমৃদ্ধ, শ্রেষ্ঠ বলে মনে করে তাদের কাছে নতি স্বীকার করতে অস্বীকার করা। কারণ ঐ সকল তত্ত্ববিদ্‌রা তাদের সূত্র বা মতবাদ সমূহের সাক্ষ্য প্রমানে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। মহান ঈশ্বর বা সৃষ্টিকর্তার মহিমা ও গৌরব প্রকাশের তাৎক্ষনিক নিদর্শন স্বরূপ বিশ্বব্রক্ষান্ডের অবর্ণনীয় রহস্য তথা পৃথিবীস্থ, পৃথিবীর উপরোস্থ, ভূগর্ভস্থ প্রতিটি বস্তুরই সৃষ্টিমাহাত্ব সম্পর্কে আমাদের প্রত্যেকেরই সূক্ষ্ম বিবেচনা করা আবশ্যক। যারা এ বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করে তারা যেন নিবীড় ভাবে মনোযোগী হয়ে পবিত্র বাইবেল অধ্যয়ন ও বিশ্লেষন করে কারণ বাইবেল এমনই একটি গ্রন্থ যেখানে বিভিন্ন পুস্তকের সমাহার, বর্ণনা করে সৃষ্টিতত্ত্ব থেকে শুরু করে মনুষ্যজীবনের বিভিন্ন বৈচিত্রময় বৈশিষ্ট্য সমূহ।

এটা মূর্খতারই সামিল হবে যদি আমরা ধারণা করি যে, ঈশ্বর কোনরকম উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনা ছাড়াই স্বর্গ ও মর্ত্যকে তাঁর প্রজ্ঞা দিয়ে এত আকর্ষণীয় ভাবে সৃষ্টি করেছেন!! শুধুমাত্র মানুষ নয় প্রতিটি সৃষ্ট বস্তুতেই রয়েছে তাঁরই অনুরূপ অতুলনীয় বৈশিষ্ট্যের সংযোগ। সুতরাং

আবশ্যাম্ভাবিক বলা যায় এই পৃথিবী এবং তাতে স্থিত প্রানের জন্য ঈশ্বরের ভবিষ্যৎ কোন উদ্দেশ্য আছে। আর একমাত্র বাইবেলই সেই উদ্দেশ্য বা পরিকল্পনা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে,

"সত্যই আমি জীবন্ত, এবং সমস্ত পৃথিবী সদাপ্রভুর প্রতাপে পরিপূর্ণ হইবে" (গণনাপুস্তক ১৪:২১)।

কারণ বা উদ্দেশ্য হচ্ছে যীশু খ্রীষ্ট ফিরে আসবেন এই পৃথিবীতে, পবিত্র বাইবেল বা ঈশ্বরের বাক্যের পূর্ণতা লাভ করবে অর্থাৎ সমস্ত পৃথিবীর মানুষ ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশ করবে পরিত্রাণ প্রাপ্তি বা পাপবিহীন হয়ে, খ্রীষ্টের আগমনে তারা জীবনমুকুট লাভ করবে। (রোমীয় ২:৬-৭, প্রকাশিত বাক্য ২২:১২ ও দানিয়েল ৭:২৭)।

বর্তমান জগত আমাদের কিই বা দিচ্ছে? বা এই জগতে জীবন পদ্ধতি? হতাশাপূর্ণ জীবন এবং অবশেষে মৃত্যুই যার পরিনতি!! কিন্তু মৃত্যু পরবর্তী কোন আশা কি আছে? নাকি মৃত্যুই জীবনের সর্বশেষ পরিনতি? আমরা কি এই জগতে ঘটে যাওয়া সব ঘটনাতেই সন্তুষ্ট হতে পারছি? আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম তো একইরকম অবস্থার মধ্যেদিয়ে তাদের জীবন কাটাবে? এবিষয় কি সূখী করতে পারছে চিরজীবনের মত? আমরা কি বর্তমান মন্দতার বেড়ে যাবার হারকে আলিঙ্গন করতে পারছি সর্বক্ষেত্রে? মৃত্যুর হারের বৃদ্ধি? ভয়ঙ্কর সর্ব সমস্যাদির মুখোমুখি হয়ে স্বাভাবিক মনুষ্যত্ব বা ব্যক্তিত্ব পঙ্গু হয়ে চলেছে, কতদিন চলবে এ অবস্থা তার সঠিক উত্তর কারোর জানা নেই।

হ্যাঁ! একমাত্র পবিত্র বাইবেলেই এ সব প্রশ্নেরই সঠিক উত্তর দিতে পারে। যদিও বর্তমান জগতের সবকিছুই ঈশ্বরের দৃষ্টিতে নেগেটিভ তবুও সবকিছুরই পজিটিভ দিক আছে। ঈশ্বরের চিহ্নিত বিষয়গুলিতে এবং অবশ্যই পবিত্র বাইবেলে, প্রজ্ঞাই নির্দেশ দেবে ও পরিচালিত করবে একটি স্বাধীন, নতনম্র মানসিকতার অধিকারীকে যার দ্বারা সে সব বাধা উপেক্ষা বা অতিক্রম করে সত্য পথে এগিয়ে যেতে সক্ষম হবে।

সিদ্ধান্ত? আমার, আপনার!!

সুধী পাঠক দয়াকরে পুস্তিকাটি পাঠ শেষে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর লিখে বা কোন মন্তব্য করে আমাদের ঠিকানায় পাঠাবেনঃ-

১। কিভাবে এত সুষ্ঠভাবে বিভিন্ন জটিলতর গাছ, গাছালি ও পশুপাখী তাদের নিজ নিজ অস্তিত্ব ধারনে সক্ষম হচ্ছে?

২। কেন বিশ্বাস করা অসম্ভব যে, ঈশ্বর সকল বস্তুরই সৃষ্টিকর্তা এবং বিবর্তনবাদের তত্ত্বে বিশ্বাস করা?

৩। "এই জগত পাপে পরিপূর্ণ"- কিভাবে বিবর্তনবাদ এই বিষয়টি ব্যাখা করবে? বা বিবর্তনবাদীদের মতে এ বিষয়টির ব্যাখা কি?

৪। এই পৃথিবীর উপরে জীবনের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি। সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর এ সম্পর্কে কি প্রকার চিন্তা করেছেন?

খ্রীষ্টাডেলফিয়ান বাইবেল স্টুডেন্টস্

পি ও বক্স নং ৯০৫২, বনানী, ঢাকা, ১২১৩, **বাংলাদেশ**

৩বি, ৩২১ যোধপুর পার্ক, কোলকাতা, ৭০০০৬৮, পশ্চিমবঙ্গ, **ভারত**

খ্রীষ্টাডেলফিয়ান বাইবেল স্টুডেন্টস্
পি ও বক্স নং ৯০৫২, বনানী, ঢাকা, ১২১৩, **বাংলাদেশ** থেকে প্রকাশিত
৩বি, ৩২১ যোধপুর পার্ক, কোলকাতা, ৭০০০৬৮, পশ্চিমবঙ্গ, **ভারত**

God created all things - Evolution is false

God's purpose with mankind proved
by the wonder of the Universe

Edited by G.E. Mansfield
Logos Publications

ভাষান্তর ঃ ডরোথী দাশ বাদলু

Published by:

Christadelphian Bible Students

P.O. Box 9052, Banani, Dhaka, 1213, **Bangladesh**

3B, 321 Jodhpur Park, Kolkata, 700068, West Bengal, **India**

© Copyright Bible Text: BBS (with permission)

March 2011